বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

চতুর্থ সেমিস্টারের অন্তর্গত এস ই সি -টু কোর্সের জন্য উপস্থাপিত

প্রকল্প পত্র :-মধ্য যুগের রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবত অনুবাদের প্রাসঙ্গিকতা

শিক্ষার্থীর নাম :- চন্দনা খাটুয়া

সেমিস্টার :-চতুর্থ

পত্র -এস ই সি -টু

রেজিস্ট্রেশন নং -২১১০৪০২০১,২০২১-২০২২

রোল নং :-১১১৪১৫২-২১০০০৫

শিক্ষাবর্ষ :২০২২-২০২৩

Phone: 9932873484/7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014

At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: PurbaMedinipur, PIN 721650

www.sjmahavidyalaya.in| Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that Chandana Khatua Roll: 1114152 No: 210005, Regd. No:- 211040201 of 2021 - 2022, a student of B.A. 4th Semester (Honours), Bengali Department, Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-2023; submitted his/her project report for partial fulfillment of the syllabus of SEC-2,(CBCS) prescribed by Vidyasagar University. The project has been prepared under the supervision of Dr. Madhumita Basu and Surajit Mandal and ready to place before examiner for evaluation.

Dr. Ratan Kumar Samanta
Principal
S.J Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

Supervisors

Dr. Madhumita Basu
Assistant Professor & HOD
Department of Begali.
S.J Mahavidyalaya

Head of the Department,
Department of Bengali
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad, P.S.- Nandigram, Purba Medinipur, Pin- 721650

Surajit Mandal
SACT-I, Department of
Bengali
S.J Mahavidyalaya
Mahavidyalaya

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

: সূচিপত্র :

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	প্রকল্প বিষয়ক সাধারন আলোচনা	৩ - ৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	বিষয়বস্তু নির্বাচন	৪
তৃতীয় অধ্যায়	বিষয় সমালোচনা	৫ - ২২
চতুর্থ অধ্যায়	সিদ্ধান্ত	২৩
	গ্রন্থপঞ্জী	২৪
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	২৫

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

প্রথম অধ্যায়

ক) প্রকল্প কাকে বলে ?

⇒ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিত মূল্যায়নের মাধ্যমে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাকে প্রকল্প বলা হয়।

খ) প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি কী কী ?

⇒ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি হল —

(i) সমস্যা কেন্দ্রিক : প্রকল্প হল সমস্যা কেন্দ্রিক অর্থাৎ কোনো না কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(ii) উদ্দেশ্য ভিত্তিক : কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য করে বা কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(iii) সৃজনশীলতা : প্রকল্পের কাজের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে।

(iv) অভিনবত্ব : প্রকল্প মূলক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের মধ্যে অভিনবত্ব দেখা যায়।

(v) অনুসন্ধান মূলক কাজ : প্রকল্প করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা রকমের অনুসন্ধান মূলক কাজের মধ্যে দিয়ে যেতে।

(vi) বাস্তব কেন্দ্রিকতা: প্রকল্প ভিত্তিক কাজ সর্বদা কোনো না কোনো বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

(vii) প্রকল্প মূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে সহযোগীতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সামাজিক গুনাবলী গুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ গড়ে ওঠে।

(গ) প্রকল্প কয়প্রকার ও কী কী?

⇒ প্রকল্প সাধারনত ২ প্রকার হয়, যথা —

(i) একক প্রকল্প।

(ii) দলগত প্রকল্প।

(ঘ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

⇒ প্রকল্পের উদ্দেশ্য গুলি হল —

(i) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ করা এবং তাদের দলবদ্ধ করা। মানসিক বিকাশ সাধন করা।

(ii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা বৃদ্ধি করে।

(iii) প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পড়ার বইয়ের বাইরে গিয়ে নিজস্ব জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়।

প্রকল্প মূলক কাজের উপকারিতা:

① প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

② শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ার বইয়ের বাইরে গিয়ে নিজস্ব জ্ঞান অর্জনে সুযোগ পাওয়া যায়।

প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

বর্তমানে প্রতিযোগীতা মূলক আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রতিটি দেশে সমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামষ্টিক অর্থনীতির দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়, তারই অংশ হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনার সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহন করা হয়ে থাকে। এবং সেই প্রকল্প সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় যাতে জাতীয় উন্নয়ন অব্যাহত থাকে।

মধ্যযুগে রামায়ন, মহাভারত এবং ভাগবত অনুবাদের প্রাসঙ্গিকতা

অনুবাদ সাহিত্য

অনুবাদ কথার অর্থ হল ভাষান্তর। অর্থাৎ কোনো ভাষাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করাকে অনুবাদ বলা হয়।

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ দুই প্রকার, যথা —
(i) আক্ষরিক অনুবাদ।
(ii) ভাবানুবাদ।

(i) **আক্ষরিক অনুবাদ** : অনুবাদক যখন প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি শব্দের হুবহু অনুবাদ করে তখন তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা হয়।

(ii) **ভাবানুবাদ** : অনুবাদক যখন মূল বিষয়কে ঠিক রেখে নতুনভাবে বাক্য তৈরী করেন তখন তাকে ভাবানুবাদ বলা হয়।

অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা :

(i) কোনো এক ভাষার গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্যভাষী মানুষের উপযোগী করে তোলার জন্য অনুবাদের প্রয়োজন।

(ii) অনুবাদের মাধ্যমে দুরের পৃথিবীর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি।

(iii) কোনো ভাষার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, মনের ভাব, ও প্রয়োজনীয় তথ্য অন্যভাষী মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুবাদ প্রয়োজন।

অনুবাদের বৈশিষ্ট্য:

(i) অনুবাদ হল একরকমের শিল্প। এর ভাব ও ভাষার মধ্যে মিল থাকতে হবে।

(ii) অনুবাদের বিষয়টি বার বার পড়ে মূল বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

(iii) অনুবাদ করার সময় কঠিন ভাষা ব্যবহার না করে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করতে হবে।

(iv) অনুবাদ করার সময় মূল বিষয়কে ঠিক রেখে অনুবাদ করতে হবে।

(v) ভাষার সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য বড়ো বড়ো বাক্যকে ভেঙে ছোটো ছোটো বাক্যে অনুবাদ করতে হবে।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের ধারা :

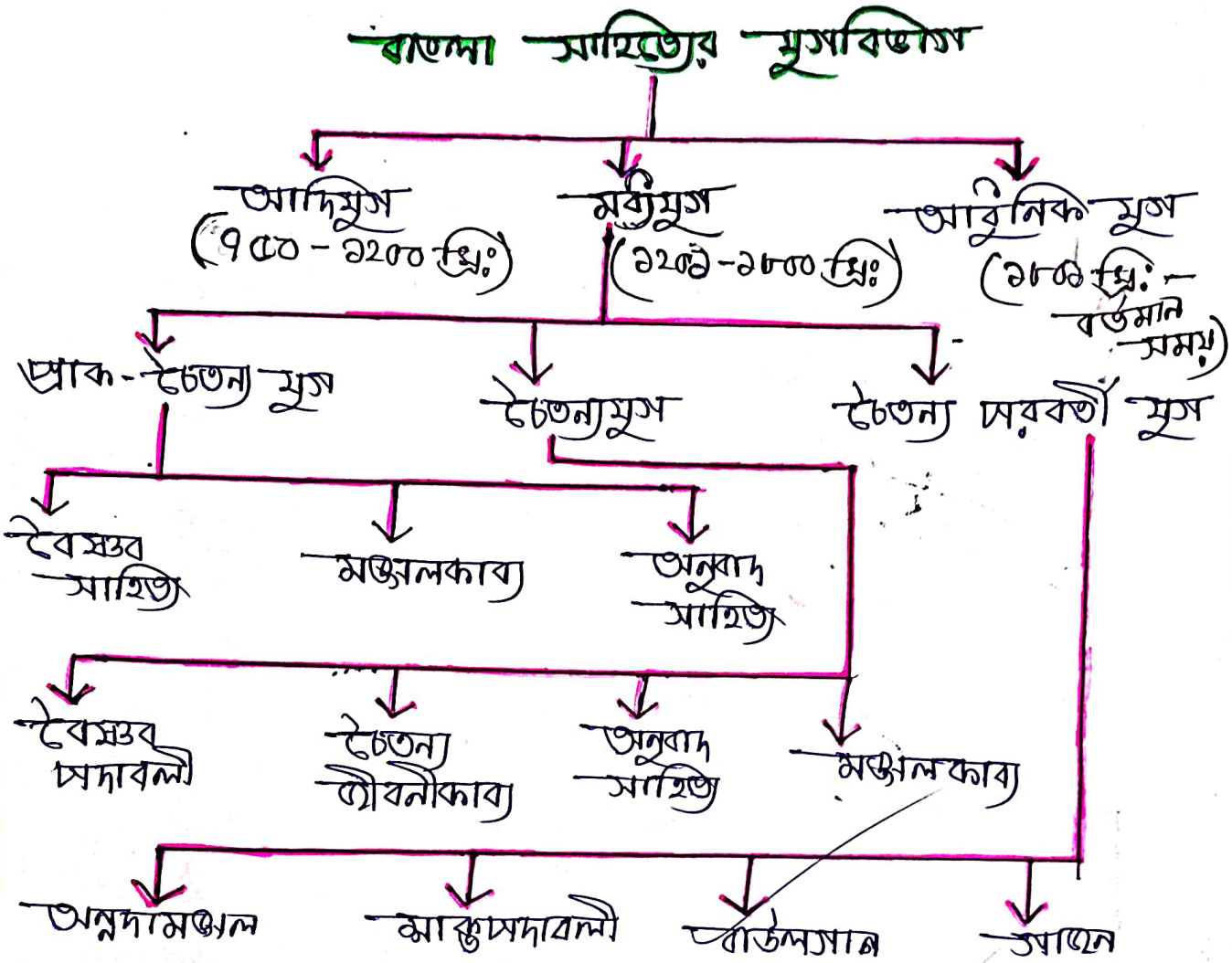

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছর বা তার চেয়েও বেশি সময়ের ইতিহাস। বাংলা সাহিত্যে এই হাজার বছরের বেশি সময়ের ইতিহাসকে মনে রাখার সুবিধের জন্য যুগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যদিও সাহিত্যের ইতিহাসে সব-সময় সাল - তারিখের হিসেবে সঠিক যুগবিভাগ করা যায় না, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সুবিধার্থে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে —

(i) প্রাচীন যুগ বা আদিযুগ [৭৫০ - ১২০০]
(ii) মধ্যযুগ [১২০১ - ১৮০০ খ্রিঃ]
(iii) আধুনিক যুগ। [১৮০১ - বর্তমান সময়]

এখানে আমার আলোচ্য বিষয় হল —— মধ্যযুগে রামায়ন, মহাভারত এবং ভাগবত অনুবাদের প্রাসঙ্গিকতা।

মধ্যযুগে রামায়ন, মহাভারত এবং ভাগবত অনুবাদের প্রাসঙ্গিকতা

অনুবাদ সাহিত্যের প্রধান তিনটি ধারা।
যথা ——
(i) রামায়ন।
(ii) মহাভারত।
(iii) ভাগবত।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে যেসব সাহিত্য রচনা হয়েছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ন হল অনুবাদ সাহিত্য। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্য এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। রামায়ন, মহাভারত এবং ভাগবত অনুবাদ করে বাঙালী কবিরা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ন, মহাভারত এবং ভাগবতের যেসব ভাবানুবাদ প্রচার হয়েছিল তার থেকে বোঝা যায় কাশীরাম দাসের রামায়ন ও মহাভারতের অনুবাদগুলি বিশেষভাবে প্রচার হয়েছিল। বিশেষত, মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস কাহিনী ও রসকে বাঙালী জীবনের পরিবেশন করে কৃত্তিবাসের সমান অসম মহিমা লাভ করেছেন। অবশ্য মধ্যযুগে রামায়ন ও মহাভারত পাঁচালী গান আকারে অবিমিশ্রিত সমাজে পরিবেশন করা হত। কিন্তু একথা সত্য যে অনুবাদ সাহিত্য থেকে কাশীরাম দাসকে বাদ দিলে তা অসম্পূর্ন থেকে যাবে।

কিন্তু পুরাণীকরণের ধারা মহাভারত ও রামায়ণ অনুশীলনের মাধ্যমে বাঙালীর মনের প্রকৃতি বদলে দিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নাই এবং সেই পুরাণ ঐতিহ্য মঙ্গলকাব্যের প্রাচীন ধারাকে কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো পরোক্ষভাবে নতুন জীবন দান করেছিল। কিন্তু এমন বৈষ্ণব ভাবপ্রবাহ দেশের সমস্ত মাটিকে আবেগের রসে আর্দ্র করে রেখেছিল। এই সমস্ত কারণে সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু অনুবাদকের আবির্ভাব হলেও দুই-একজনকে বাদ দিয়ে কেউ তেমন কবি প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেনি। অবশ্য দুই একজন বাঙালী অনুবাদক বাঙালীর জীবনকে পৌরাণিক প্রভাবের আশ্রয়ে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুবাদ সাহিত্য বাঙালীর ধর্মকে কতদূর প্রভাবিত করতে পেরেছে তা রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে বোঝা যাবে।

সামাজিক প্রেক্ষাপট :

মধ্যযুগে বাংলাদেশে ১২০৬ খ্রিঃ-তে তুর্কী আক্রমণ হয়েছিল তাতে বাংলাদেশের সমাজ এক সমস্যার মুখে পড়ে। তখন বাঙালি জীবন একদিকে বাঁচবার প্রার্থনা অন্যদিকে প্রাণরক্ষার তাগিদ। মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড়ো চাওয়া হল, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা ও নিজ নিজ ধর্মে ও কর্মে মনস্থির করা। এই সুন্দর জীবন যাপনে যখন বাধা আসে তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ভয়াবহ আশঙ্কা দেখা দেয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত আমরা মধ্যযুগের একটি স্থূল কালসীমা নিরূপণ করতে পারি, যার আদিতে আছে সেন বংশের শাসন কালের শেষ সীমা এবং অন্যদিকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব।

মধ্যযুগে বাংলা অনুবাদ সাহিত্য থেকে বাঙালির হৃদয় চেতনার স্বরূপ নির্ণয়ের আগে আমাদের যুগ চেতনার স্বরূপ জেনে রাখা প্রয়োজন।

লক্ষ্মণ সেনের সভাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের মন্থন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল, তখন ইসলাম ধর্মের কিছু তুর্কী যারা পর্বতে বসবাস করত তারা বাংলাদেশ দখল করে ফেলল। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর ধরে এই ইসলামদের রাজত্ব ছিল। একে 'বঙ্গ সংস্কৃতির তামস যুগ' (The dark age) বলা হয়।

চৈতন্য আবির্ভাব ও হোসেন শাহী আমলের মাধ্যমে এই তামস যুগ নতুন জীবনের আলোর রেখায় পরিবর্তিত হল। মধ্যযুগের বাঙালী বিভিন্ন প্রতিকূলতা বহিরাক্রমে সংবাদ ও বিভিন্ন অত্যাচারের মধ্যে ও আলোর সাধনা করেছে। মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে এইসব ইতিকথা আমরা জানতে পারব। অনুবাদ সাহিত্য গড়ে উঠেছে মহাভারত, রামায়ন এবং ভাগবত অবলম্বন করে।

মধ্যযুগে প্রবর্তিত ছিল বহিরাক্রমনের যুগ। এই সময় বাংলাদেশের জনজীবন বিপদে ছিল। বাংলাদেশের মানুষ তখন নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে। তখন প্রত্যেকের একটাই প্রার্থনা ছিল ————

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

বাংলাদেশে বল্লাল সেন যে কৌলিন্য প্রথা প্রচলন করেছিলেন তাতে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে বিভিন্ন জাতিভেদ সমস্যা দেখা দেয়। বিভিন্ন ধরনের প্রথার ফলে হিন্দুসমাজ ক্রমশ বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যায়। তুর্কী সেনার আক্রমনে বিপর্যয় আরো বিশাল আকার ধারন করতে থাকে। তুর্কী সেনারা বাংলাদেশে অত্যাচার, ধনসম্পদ লুন্ঠন ও হত্যাকান্ড চালিয়ে যায়। প্রানভয়ে কিছু বাঙালীরা ভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের ঘৃনা ও অবজ্ঞা থেকে বাঁচবার জন্য নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। মুসলীম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এলো। হিন্দু সমাজের এই বিপর্যয় দেখে হিন্দু দলপতিরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হিন্দু দলপতিরা ঠিক করলেন যে উচ্চশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে ঐক্য বন্ধন ঘটাতে হবে তাতেই এই বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

সংস্কৃতি সমন্বয়ের মনোভাব :

সমাজের উচ্চশ্রেনীর মানুষেরা নিম্নশ্রেনীর মানুষদের অবজ্ঞা না করে কাছে টেনে নিলেন। এতকাল উচ্চশ্রেনীর মানুষদের বিভিন্ন শাস্ত্রচর্চার অধিকার ছিল এবং নিম্নশ্রেনীর মানুষেরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তুর্কী আক্রমনের ফলে অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষেরা বুঝতে পারলেন যে, হিন্দুসমাজকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে গেলে সর্বপ্রথম পুরানের হিন্দু ধর্মের কথা সাধারন মানুষের মধ্যে প্রচার করতে হবে, এর ফলে হিন্দুসমাজ জাতিভেদ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। পৌরানিক আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করলে জ্ঞানহীন নিম্নশ্রেনীর মানুষেরা ইসলাম 'ধর্ম' গ্রহন করবে না।

সাহিত্য ও সংস্কৃত চর্চার মাধ্যমে হিন্দুসমাজের আত্মিক মিলনের সূত্রপাত হল, এর ফলে দেখা দিল অনুবাদ সাহিত্যের ব্যাপক চাহিদা। সংস্কৃত সম্পর্কে শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত বাঙালীর কাছে শিক্ষিত অভিজাত শ্রেনীর কবিরা পুরান অনুবাদ করে তাঁদের ধর্ম নিম্নশ্রেনীর মানুষদের কাছে পৌঁছে দিলেন। তারপর বাংলা সাহিত্যে রামায়ন, মহাভারত এবং ভাগবত প্রভৃতি পৌরানিক গ্রন্থকে বাংলায় অনুবাদ করা হল।

রামায়ণের অনুবাদ :

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন আদি কবি বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুবাদ। কবি কৃত্তিবাস ওঝা সংস্কৃত রামায়ণের আদি অনুবাদক। তিনিই প্রথম উত্তর ভারতে রামায়ণ অনুবাদের সূত্রধার। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম শ্রীরামায়ণ পাঁচালী। বড় চণ্ডীদাসের পরে তিনি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি।

রামায়ণের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অনুবাদক ও তাদের কাব্যের নাম নিম্নে তুলে ধরা হল—

	সময়কাল	কবি	কাব্যের নাম
আদি অনুবাদক	সপ্তদশ শতাব্দী	কৃত্তিবাস ওঝা	শ্রীরাম পাঁচালী
বিভিন্ন অনুবাদক	সপ্তদশ শতাব্দী	নিত্যানন্দ আচার্য	অদ্ভুত আচার্য
		চন্দ্রাবতী	রামায়ণ
	অষ্টাদশ শতাব্দী	মঙ্কর চক্রবর্তী	শ্রীরাম মঙ্গল
		জগৎরাম রায়	শ্রী অদ্ভুত রামায়ণ
		রামানন্দ ঘোষ	পূতন রামায়ণ

কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালীর বৈশিষ্ট্য :

পঞ্চদশ শতাব্দীতেও কৃত্তিবাসের কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হল —

(ক) মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্যের দুটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল — (i) হুবহু মূলের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তা ভাবানুবাদ।

(ii) ভক্তিবাদের অবতারনা।

এই দুটি বৈশিষ্ট্যই কৃত্তিবাসের অনুবাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

(খ) কৃত্তিবাস তাঁর এই মহান কাব্য রচনার ক্ষেত্রে দুটি কারনের কথা বলেছেন —

প্রথমত, পৃষ্ঠপোষক রাজার আদেশ।
দ্বিতীয়ত, লোকশিক্ষার সামাজিক দায়িত্ববোধ।

(গ) বাল্মিকী রচিত মূল রামায়ন কাহিনী অবলম্বনে কৃত্তিবাস তার রচনা করলেও তিনি তাঁর প্রতিটি শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পাঁচালীর আদর্শে তাঁর রামায়ন কাব্য রচনা করেছেন। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ন হয়ে উঠেছে নতুন স্বাদের।

(ঘ) কৃত্তিবাস তাঁর রামায়নে কোনো কোনো কাহিনী সম্পূর্ন কল্পনা বলে সৃষ্টি করেছিলেন, আবার কিছু পুরানাদি থেকে সংগ্রহ করেছেন।

(ঙ) কৃত্তিবাস রচনা করেছেন বাঙালীর মন নিয়ে বাঙালীর মতো করে বাংলা রামায়ন সাধারন লোকেদের সহজ ভাষায় বোঝাবার জন্য তাঁর অনুবাদ ——

'লোক বুঝাইতে কৈলা কৃত্তিবাস পন্ডিত।'

(চ) কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালী মহাকাব্য নয়, এটি হল বাল্মীকির মহাকাব্যের সেই গম্ভীর করুন আম্য যাতে বাংলা পয়ারের ছন্দে পরিনত হয়েছে বাঙালির ভাবাপ্লুত ভক্তিরস।

(ছ) শুধু কাহিনী বিন্যাসে নয় চরিত্র চিত্রনে, মুসলৌকিকের রসায়নে, বাঙালীয়ানার পরিচয়, ভক্তিবাদের প্রচারে, করুন রসের উৎসারে এবং স্বতন্ত্র কবি দৃষ্টির পরিচয়ে কৃত্তিবাসের অনুবাদের স্বাতন্ত্র অতুলনীয়।

মহাভারতের অনুবাদ :

সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক কবি কাশীরাম দাস। এই কবির মহাভারতের কাছে অন্যান্য অনুবাদগুলি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কাশীরাম দাস আসামের বাঙালী অসমিয়াদের অকৃত্রিম কল্যাণ সাধন করেছেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ধারায় কাশীরাম দাসের রচনা কর্ম হলেও বাঙালীর জাতীয় জীবনে তাঁর মহাভারত অক্ষয় বটবৃক্ষের মত চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কবি কৃত্তিবাসের মতো কাশীরাম দাস সমস্ত বাঙালী জাতির মনঃপ্রকৃতি, ব্যক্তি জীবন, সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শ এবং নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে কাশীরাম দাসের নাম বাংলার জাতীয় জীবনে চির-কালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম 'মহাভারত'।

মহাভারতের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অনুবাদক ও তাদের কাব্যের নাম নিম্নে তুলে ধরা হল :

	সময়কাল	কবি	কাব্যের নাম
কেন্দ্রীয় অনুবাদক	ত্রয়োদশ শতাব্দী	কাশীরাম দাস	মহাভারত
বিভিন্ন অনুবাদক	ষোড়শ শতাব্দী	কবিন্দ্র পরমেশ্বর	পান্ডব বিজয়
	সপ্তদশ শতাব্দী	নিত্যানন্দ ঘোষ	মহাভারত
	অষ্টাদশ শতাব্দী	গুরুসোত্তম দাস	পান্ডব পাঁচালী

◘ কাশীরাম দাসের মহাভারতের বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) মহাভারত অনুবাদের ক্ষেত্রে কাশীরাম দাস হুবহু অনুবাদ করেন নি। তিনি কৃত্তিবাসের মতো মর্মানুবাদ করেছেন।

(খ) কবি সাধারন মানুষের কথা ভেবে, রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করবার জন্য সাধারন মানুষের উপযোগী করে তাঁর মহাভারত রচনা করেছেন। তিনি কাব্যে উল্লেখ করেছেন ——

'যেই বাঞ্ছা করি লোক শুনয়ে ভারত।
গোবিন্দ করেন পূর্ণ তার মনোরথ॥'

(গ) কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারতে বেশ কিছু বিষয়ও যোগ করেছেন, যেমন, বনপর্বে শ্রীবৎস মাহাত্ম্য, শান্তিপর্বে একাদশী মাহাত্ম্য ও হরিমন্দির মার্জনের ফল প্রভৃতি মূল মহাভারতে নেই।

(ঘ) কাশীরাম অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদের রীতিকে গ্রহন করেছেন।

(ঙ) কাশীরাম তাঁর কাব্যে কৃত্রিম কাব্যকলার অনুসরন করেছেন। সেজন্য তিনি তাঁর কাব্যে অলংকারমুখর ছন্দ ঝংকারকে অনুসরন করেছেন।

ভাগবতের অনুবাদ :

কবি কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক অনুসরনে ভাগবত পুরানের অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যকে সবিবর্ধিত ও সমৃদ্ধ করে গেছেন বর্ধমানের কুলীনগ্রাম নিবাসী কবি মালাধর বসু। সংস্কৃত সাহিত্যে আঠারোখানি পুরান ও অষ্টাদি উপপুরানের মধ্যে ভাগবত পুরানই ভারতবর্ষে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বারোটি স্কন্ধে বিভক্ত ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন মাহাত্ম্য বর্নিত হয়েছে, মালাধর বসুর অনূদিত গ্রন্থের নাম "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়"।

ভাগবতের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অনুবাদক ও তাদের কাব্যের নাম নিম্নে আলোচনা করা হল

	সময়কাল	কবি	কাব্যের নাম
শ্রেষ্ঠ অনুবাদক	পঞ্চদশ শতাব্দী	মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়
বিভিন্ন অনুবাদক	ষোড়শ শতাব্দী	রঘুনাথ পন্ডিত	শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী
	অষ্টাদশ শতাব্দী	শঙ্কর কবিচন্দ্র	গোবিন্দ মঙ্গল
		দ্বিজ রমানাথ	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়

☐ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়-এর বৈশিষ্ট্য :

(ক) ভাগবতের দশম খণ্ড ও একাদশ খণ্ড অনুবাদ করেছেন মালাধর বসু। তাছাড়া ভাগবতের বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনী অনুসরণে বৃন্দাবন লীলা, রাসলীলা, দানলীলা ও নৌকালীলা অংশে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়া লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রনয়লীলা তার অংশে স্থান পেয়েছে।

(খ) মালাধর বসু তার কাব্যে তিনটি পর্যায়ে কাহিনী বিন্যাস করেছেন। যথা —— বৃন্দাবনলীলা, মথুরা-লীলা ও দ্বারকালীলা।

(গ) অনুবাদের ক্ষেত্রে মালাধর বসু ভাগবতের বিষয়কে পয়ার ত্রিপদী ছন্দে জনসাধারণের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে।

(ঘ) এক ঐতিহাসিক পটভূমিতেই শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা, কারন সেদিনের দুর্বল পরাজিত হতমান জাতির আন্তরীক আকাঙ্খাই ছিল গৌরবময়।

(ঙ) কাব্যসমাপ্তিতে কবি 'পুত্রধর্ম' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ——

'নোতি বাক্য হব অধর্ম্ম পালিব
মোর বনি দেখিব তার সব হবি লব॥'

তৎকালীন সমাজে পাঠান শাসনকালের সামাজিক বিশৃঙ্খলা এই উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা :

ইসলাম ধর্মান্তরীকরণের অবক্ষয় থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার জন্যেই মূলত অনুবাদ কর্ম শুরু হয়েছিল। এই ব্যাপারে স্বভাবসুলভ গুণ সাহিত্যের জন্য মুসলিম শাসকেরাও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহী হন। অনেক অনুবাদক কবিরা মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ইলিয়াসশাহী বংশের নৃপতিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সদা বিজিত একটি দেশকে শাসন করতে গেলে সেই দেশের মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপন করতে হবে এবং দেশের আচার ব্যবহার ও সংস্কৃতিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে হবে। তাই মুসলমান শাসকেরা হিন্দু কবিদের দিয়ে পুরান অনুবাদ করিয়ে রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাগবত, রামায়ন ও মহাভারতের অনুবাদ হিন্দু - মুসলমান প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন ——

"মুসলমান, ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতে আসুন না কেন; এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ রূপে বাঙালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু প্রজামন্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘন্টা বাজিতে লাগিল; মহরম, ঈদ, সবেবরাত প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস দোল উৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল, রামায়ন ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাবে মুসলমান সম্রাটগন লক্ষ করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস নিবন্ধন বাঙ্গালা তাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদের ধর্ম, আচার - ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাহাদের পরম কৌতূহল হইল, গৌড়ের সম্রাট এদের প্রবর্তনায় হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল।"

উপসংহার :

এইভাবে অনুবাদ সাহিত্য একদিকে আর্যসংস্কৃতি ও বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির জীবন-ধারাকে মিলিয়ে দেবার অনুকূল প্রচেষ্টা সফল হল। আর্য সংস্কারের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য লৌকিক ধর্মে সীমা ছাড়িয়ে নূতনতর বিষয়ের সান্নিধ্য পরিপুষ্টি ও বিকাশের সুযোগ পেল। উচ্চ ও নিম্নসম্প্রদায়ের হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যের মাধ্যমে হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন হল, এর ফলে, বাংলা সাহিত্য বিকাশের ধারায় নূতন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ লাভ করল। অনুবাদ সাহিত্যের ফলে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য রামায়ন, মহাভারত এবং ভাগবতের সঙ্গে বাঙালীর যোগসূত্র স্থাপিত হল। মধ্যযুগে অনুবাদ কাব্যগুলি ভারতের পৌরাণিক সংস্কৃতিকে ধারন করে জনগনের কাছে সহজ-সরল ভাষায় পৌঁছে দিয়েছে। সংস্কৃত ভাষার বন্ধন থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঙালী কবিরা জন-গনের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার প্রয়াস দেখা যায় অনুবাদ সাহিত্যে।

সিদ্ধান্ত

বিস্তারিত আলোচনার পর আমি দেখলাম যে মধ্যযুগে মূলত ইসলাম ধর্মান্তরীকরণের অবক্ষয় থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার জন্যই অনুবাদ শুরু হয়। উচ্চ ও নিম্ন সম্প্রদায়ের হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন ও সর্বভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী জাতি ও বাংলা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের যোগ স্থাপনের জন্য মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্য ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন। এর ফলে বাংলা সাহিত্য নূতন শক্তি ও সৌন্দর্যে পরিপুষ্টি লাভ করল। এভাবেই অনুবাদ সাহিত্য মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

(i) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত → তৃতীয় খণ্ড :
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় পর্ব
মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী / কলকাতা : ৭০০ ০৭৩
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫ – ২০১৬

(ii) আদি-মধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়
৭/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০০৯
পুনর্মুদ্রণ → জুন, ২০১৫

(iii) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
ডঃ শ্রীমন্তকুমার জানা
ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০ ০০৯
পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ়, ২০১৪

(iv) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
ডঃ দেবেশ কুমার আচার্য
২৭/১ কলেজ রো, কলকাতা – ৯
সপ্তম মুদ্রণ : আষাঢ়, ২০১৬

গ্রন্থপঞ্জী

(i) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত → তৃতীয় খণ্ড :
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় পর্ব
মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী / কলকাতা : ৭০০ ০৭৩
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫ – ২০১৬

(ii) আদি-মধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়
৭/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০০৯
পুনর্মুদ্রণ → জুন, ২০১৫

(iii) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
ডঃ শ্রীমন্তকুমার জানা
ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০ ০০৯
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৪

(iv) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,
ডঃ দেবেশ কুমার আচার্য
২৭/১ কলেজ রো, কলকাতা – ৯
সপ্তম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যেসব ব্যক্তি সহযোগিতার ও পরামর্শের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সেইসমস্ত গ্রন্থাগারকে যেখান থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ও নথিপত্র আমার প্রকল্প রচনার কাজে সাহায্য করেছে। এছাড়া স্বর্নময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা এবং অধ্যাপকদের পরামর্শ নির্দেশনা পরিচালনায় আমার এই অনুসন্ধান মূলক কাজটি সফল হয়েছে।

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

চন্দনা আড়ুয়া

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

EXAMINED
(External) 2/9/23

শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর